

বিজ্ঞানশিক্ষায় অনীহা কেন

শিক্ষা

আমিরুল আলম খান

‘সমৃদ্ধ অতীত সত্ত্বেও শুণ্যুগের পর ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চার আর প্রসার ঘটেনি।’ বাঙালির বিজ্ঞানসাধনা সম্পর্কে এ কথা লিখেছেন অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা। তিনি আরও লিখেছেন, ‘শিক্ষাবিস্তারের ইউরোপে যখন বিজ্ঞান বিকশিত, আমাদের দেশে তখন মধ্যযুগের অন্ধকার। ইউরোপে অন্ধকার যুগ অর্ধ-সহস্র বৎসর স্থায়ী হলেও আমাদের দেশে তার পরমায়ু ছিল প্রায় দ্বিগুণ।’ এ দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা শুরু ব্রিটিশ শাসনকালে, উনিশ শতকে। সমুদ্রপার থেকে তা আমদানি করে যে জোড়কলম বাঁধা হয়েছিল, তা যে আজও ঠিকমতো জোড়া লাগেনি তা বোঝা যায় বাংলাদেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানশিক্ষায় অনীহা দেখে। বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কমছে। ২০১৩ সালে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী ছিল মাধ্যমিকে ২২ দশমিক ৯২ শতাংশ আর উচ্চমাধ্যমিকে মাত্র ১৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতে প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীদের ৪২ দশমিক ৮৫ শতাংশই হলো বিজ্ঞান শাখার, আধুনিক ভারত বিনির্মাণে যাদের ভূমিকা অপরিণীয়।

উপনিবেশিক যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্সকে কেন্দ্র করেই বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা গবেষণার সূত্রপাত। এসব সংস্থার সামগ্রিক অবদান জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, কুদরাত-ই-খুদা প্রমুখ বিজ্ঞানী। অঘোরচন্দ্র হলেন প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী, যিনি বিদেশ থেকে (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়) রসায়নে ডিএসসি

ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু কোনো বিজ্ঞান সংস্থায় কাজ করার সুযোগ পাননি তিনি, প্রশাসনে কেরানিগিরিতে তাঁর প্রতিভার অপচয় ঘটে, যেমনটি ঘটে সি.ভি.রমন বা কুদরাত-ই-খুদার ক্ষেত্রেও। গবেষণাহীন নয়, শাসকশ্রেণি কুদরাত-ই-খুদার কর্মস্থল অবিস্ফার করে শিক্ষা প্রশাসনে।

পরাজনিত যুগে যা-ই ঘটুক, স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার এ দুরবস্থা কেন? ব্যানবেইনের পরিসংখ্যান দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। ১৯৯০ সালে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী ছিল মাধ্যমিকে ৪২ দশমিক ৮১ শতাংশ আর উচ্চমাধ্যমিকে ২৮ দশমিক ১৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান বলছে এই সর্বোচ্চ শতকরা হার আর কখনোই স্পর্শ করা যায়নি। উচ্চমাধ্যমিকে ১৯৯৬ সালে সর্বনিম্ন পর্যায়ে, প্রায় অর্ধেক, মাত্র ১৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ নেমে যায়। এরপর ২০০২ সালে তা বেড়ে হয় ২৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। তারপর আবার পতনের শুরু এবং ২০১৩ সালে তা নেমে আসে শতকরা ১৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশে। অতিরিক্ত চিত্র মাধ্যমিকেও। বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীর শতকরা হার ১৯৯০ সালের ৪২ দশমিক ৮১ থেকে কমে কমে ২০১৩ সালে হয় মাত্র ২২ দশমিক ৯২ শতাংশ। বিজ্ঞানশিক্ষায় কী ভয়ংকর ভূমিধস!

অন্যদিকে শিক্ষার্থী বাড়ছে ব্যবসায় শিক্ষায়। ১৯৯০ সালের উচ্চমাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় মোট পরীক্ষার্থীর হার ১৯ দশমিক ৪১ থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে দাঁড়ায় ৩৪ দশমিক ১৯ শতাংশে। অর্থাৎ সেখানে বৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণ। আর মাধ্যমিকে ১৯৯৮ সালে ব্যবসায় শিক্ষা চালুর সময়ের ৭ দশমিক ৩ থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে ২০১৩ সালে হয়েছে ৩৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভিড় করছে বিজ্ঞানের বদলে ব্যবসায় শিক্ষায়। কী কী কারণে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী কমছে এবং ব্যবসায় শিক্ষায় তা বাড়ছে তা অনুসন্ধান করা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি এর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিঘাত অনুসন্ধান করা।

বিজ্ঞান পঠন-পাঠন অপেক্ষাকৃত কঠিন। সে

জন্য দুনিয়াজুড়ে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে কম। প্রযুক্তির অতি দ্রুত বিকাশ, বাণিজ্যের প্রসার এবং করপোরেট পুঞ্জির দুর্দমনীয় বিশ্বায়ন শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বিন্যাসের অন্যতর কারণ। সেই সঙ্গে সিলেবাসের মাত্রাতিরিক্ত চাপ, বিজ্ঞানশিক্ষার অত্যন্ত ব্যয়ভার, শিক্ষায়তনগুলোতে বিজ্ঞান পাঠের অনুপযোগী পরিবেশ, বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে প্রযুক্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব ও তা ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমান অনীহা, কেচিহনির্ভরতা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ইত্যাকার নানা সমস্যা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানবিমুখ করে তুলছে।

একটি আইনি বিধিনিষেধও আছে। বিজ্ঞান শাখায় মাধ্যমিক পাস না করে কেউ উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারে না; কিন্তু যেকোনো শাখার শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষায় ভর্তি হতে পারে। দেশে বহু স্কুলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ নেই। ওসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানের দরজা চিরদিনের তরে বন্ধ। চটকদার ডিগ্রি (বিবিএ/এমবিএ), করপোরেট জগতে মোহনীয় চাকরির প্রলোভন আর আইনি, খোলা দরজা দিয়ে বেনোজলের মতো ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ঢুকছে সভাব্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা।

সিলেবাস আরেকটি বড় সমস্যা। বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্য যে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের তুলনায় বিজ্ঞান বিষয়গুলোর সিলেবাস প্রায় তিন গুণ বড়। সিলেবাসপ্রণেতারা আমাদের তরুণ বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সিলেবাস প্রণয়ন করেননি। বিবেচনা করেননি আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। মনে হয়, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েই একেকজন বিজ্ঞানশিক্ষার্থীকে তাঁরা আইনস্টাইন বানাতে চান। এমন অনেক বিষয় সেখানে অন্তর্ভুক্ত, যা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য হওয়া সমীচীন। বইগুলো আদৌ সুখপাঠ্য নয়, পড়ানোর মতো উপযুক্ত শিক্ষক খুবই স্বল্পসংখ্যক। বইগুলো রচিত হয়েছে আমলাদের

অযাচিত হস্তক্ষেপে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (যেখানে কারিকুলাম স্পেশালিস্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কারিকুলাম কী তা-ই জানেন না!) বাস্তবতাবর্জিত সুপারিশে এবং কেবল ব্যবসায় মনোবৃত্তির প্রকাশকদের লাভালাভের নিরিখে। উপস্থাপনা, রচনাশৈলী ও প্রকাশনার মান এতই নিচু যে পাঠ্যবই হিসেবে তা কোনো মননশীল তরুণকে আকর্ষণ করে না।

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০-এ বিজ্ঞানশিক্ষার ‘উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য’ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, ‘শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞানসাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে এবং... একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞানশিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।’ কিন্তু বাস্তব চিত্র ও গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে কি তা প্রতিফলিত? নবম ও দশম শ্রেণিতে একটি সমন্বিত পাঠক্রমের বদলে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি ধারায় পৃথককরণ শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলদায়ী হয়েছে কি না, তা জেবে দেখার সময় এসেছে। প্রতিবেশী ভারতসহ দুনিয়াজুড়ে মাধ্যমিক স্তরে পৃথক শিক্ষাধারার অবসান ঘটিয়ে একমুখী শিক্ষা চালু হয়েছে প্রায় দুই দশক আগে। কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে তার সমর্থন নেই।

উৎপাদনী শক্তির সার্বিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সংযোগ, যথোপযুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন, মাত্রাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন, আনন্দদায়ক বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ, মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক ব্যবহারিক ক্লাস, তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন, উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, বিজ্ঞানানুগত্য প্রতিষ্ঠা, মেধা পাচার বন্ধ, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি ছাড়া বিজ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন অধরা স্বপ্নই থেকে যাবে।

● আমিরুল আলম খান : শিক্ষাবিদ।
AminulKhan7@gmail.com